Based on After Europe by Ivan Krastev

আফটার ইউরোপ

ভাঙনের পথে ইউরোপ

Based on After Europe by Ivan Krastev

আফটার ইউরোপ

ভাঙনের পথে ইউরোপ

ইভান ক্রাস্তেভ

অনুবাদ
শাহেদ হাসান

সম্পাদনা
রাকিবুল হাসান

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

আফটার ইউরোপ
মূল : ইভান ক্রাস্তেভ
অনুবাদ : শাহেদ হাসান
সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২

স্বত্ব
প্রকাশক

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৭৫-৭-৩

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

বাংলাবাজার পরিবেশক :
চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com
বানান সমন্বয় : আহসান হাবিব

মুদ্রিত মূল্য
২০৬ টাকা মাত্র

অর্পণ

প্রিয় বাবা-মাকে
যারা আমাকে বর্তমান অবস্থানে আনার জন্য
নিজের সবটা অর্পণ করেছেন।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	০৯
সম্পাদকের নোট	১১
অনুবাদকের অভিব্যক্তি	১৫
ভূমিকা : দেজা ভ্যু মাইন্ডসেট	১৭

.....প্রথম অধ্যায়.....

আমরা, ইউরোপিয়ানরা	৩৩
অভিবাসী সংকট	৩৫
ইউরোপে মত ও ভোটের আগমন	৪৩
শরণার্থী-সংকট এবং বামপন্থিদের অবস্থান	৪৭
মানবাধিকার ও সংকট	৫০
সহনশীলতার বিরুদ্ধে বিপ্লব যার	৫২
সংহতির সংঘাত ও ইউরোপের বিভাজন	৫৬
পূর্ব-ইউরোপের সহানুভূতির ঘাটতি	৫৭

.....দ্বিতীয় অধ্যায়.....

ওরা, মানুষেরা	৬৯
লোকরঞ্জনবাদের ভূত	৭২
সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান প্যারাডক্স	৭৭
পশ্চিম ইউরোপিয়ান প্যারাডক্স	৮৬
ব্রাসেলস প্যারাডক্স	৮৯
গণভোটের কারণে ধ্বংসের শিকার	৯৫
সাহসী	৯৮
মধ্যপন্থি	৯৯
কুৎসিত	১০১

.....উপসংহার.....

ভঙ্গুর ইউরোপ ও তার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সক্ষমতা	১০৫

প্রকাশকের কথা

ইউরোপের ইতিহাস আদ্যোপান্তই যুদ্ধ ও হানাহানির ইতিহাস। শান্তি জিনিসটা কখনো ইউরোপে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো অঞ্চল কখনো এতটা যুদ্ধ-কবলিত ছিল বলে মনে হয় না। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ তো রয়েছেই, ইউরোপীয় যুদ্ধ-হিংস্রতা ও পাশবিকতার ভয়ংকর আখ্যান লেখা আছে ২০০ বছরের ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে। তারপর সহসাই ইউরোপে চেরাগায়ন হলো। সকল সহিংসতার পেছনে ধর্মকে দায়ী করে ছুড়ে ফেলা হলো ধর্মীয় মতবাদ। উত্থান হলো জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের। কিন্তু তারপরও যুদ্ধের কালো মেঘ ইউরোপের আকাশ থেকে অপসৃত হয়নি। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতা ও আধুনিকতার মোহভঙ্গ করে দিলো ইউরোপের। যুদ্ধের আগুন থেকে বাঁচতে আবারও নতুন ধারণার আশ্রয় নেয় ইউরোপ, যার চূড়ান্ত রূপ আজকের ইইউ বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। জাতিরাষ্ট্রের ধারণায় যেখানে রাষ্ট্রই ছিল সর্বেসর্বা, সেখানে এর পরিবর্তে বহুজাতিক সহায়তা আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও আন্তনির্ভরশীলতার ধারণাকে ভিত্তি করে এই নতুন রাজনৈতিক মডেল দাঁড় করানো হয়, যা ইউরোপের অন্তঃকলহকে দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সবার প্রত্যাশা ও কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে এই মডেলটিও ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হতে চলেছে নানা কারণে। কেন ব্যর্থ হচ্ছে এই মডেলটি? কী হবে ইইউ ভেঙে গেলে? এমন অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কী হবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ? ঠিক এমন গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে এই বইয়ে। রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা করেছে, তখন এই প্রসঙ্গটি কত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, সেটা বোঝা যাবে আমাদের প্রকাশিত পুতিন'স মাস্টারপ্লান বইটি আগে পড়ে নিলে।

বইটি অনুবাদ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহেদ হাসান, যিনি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি অনুবাদকর্মের মাধ্যমে এই অঙ্গনে নিজের জায়গা মজবুত করে নিয়েছেন। এ ছাড়াও

রাকিবুল হাসান ভাই সময় নিয়ে বইটি দেখে দিয়েছেন, টীকা-টিপ্পনী যোগ করেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে কাজটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন। উভয়ের জন্যই কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি পড়ে ভালো লাগলে অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার অভিব্যক্তি অবশ্যই শেয়ার করবেন। আপনাদের যেকোনো পরামর্শ ও মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে নানা স্তরে যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবাইকে এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক আপনাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রকাশনার পক্ষে,
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
addakhil791@gmail.com
০২/১২/২৩ খ্রি.

সম্পাদকের নোট

১৯৫০ সালের ৯ই মে; ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট স্কুম্যান একটি ঘোষণা দিলেন। ইতিহাসে যা স্কুম্যান ডিক্লারেশন হিসেবে পরিচিত। সেই একটি ঘোষণা আজও অব্দি ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা। হয়তো অনির্দিষ্টকালজুড়ে চলমান থাকবে।

এককথায় ইউরোপের ইতিহাস বলতে গেলে শুধু একটি শব্দেই তা ব্যক্ত করা সম্ভব—যুদ্ধ। যখন থেকে ইউরোপ ইতিহাসের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই যুদ্ধ ইউরোপের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রিক, রোমান, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ—কোনো কালে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আধুনিককালে বিশ্ব যখন সভ্য, ইউরোপ তখন দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের ভিক্টিম। এবং মোস্ট ইম্পোর্ট্যান্টলি এই যুদ্ধ তাদের ওপর বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দেয়নি, যেমনটা তারা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা-সহ সারা দুনিয়াজুড়ে করেছে।

ইতিহাসের পুরো সময়টাই ইউরোপীয়রা যুদ্ধ করেছে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে। নিজেদের হিংস্রতায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের অনেক কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা এসেছিল পশ্চিমাদের চিন্তায়। কারণ পূর্বেকার ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞ যতই হোক, গোটা সভ্যতা 'ভ্যানিশ' করে দেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়ন, আর সেই উন্নয়নের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা দেখে খোদ সেই শক্তির পূজারিরাই আতঙ্কিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার-সহ আধুনিক ও উন্নত সব মারণাস্ত্রের উন্মাদনাপূর্ণ ব্যবহার দেখে পরবর্তী আরেকটি এমন যুদ্ধে গোটা ইউরোপই মানবজাতির মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার শঙ্কায় পড়ে যায়।

যুদ্ধ কীভাবে রোধ করা যায় সেই চিন্তা পেয়ে বসে। এবং ইতিহাসের পুরো সময়জুড়ে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের চেয়ে অধিক যুদ্ধংদেহি, অধিক রক্তপিপাসু এবং অধিক খুনে জাতি ও অঞ্চল থেকে ভেসে আসতে থাকে নীতিবাক্য আর শান্তির বাণী।

স্কুম্যান ডিক্লারেশনে ভবিষ্যতে ইউরোপ কীভাবে যুদ্ধ এড়াতে পারে সেই ফর্মুলা বাতলে ছিলেন। ডিক্লারেশনে ইউরোপের কয়লা এবং স্টিলখাত সমন্বিত উৎপাদনে

নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এর পেছনে দার্শনিক যে চিন্তাটা রয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিভাষায় বলা হয় স্পিল ওভার ইফেক্ট—বা গড়িয়ে পড়ার প্রবণতা। যুক্তিটা হলো, একটা গ্লাসে যদি পানি ঢালতে থাকা হয়, একসময় গ্লাসটা পূর্ণ হয়ে আশেপাশেও পানি গড়িয়ে পড়বে।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা। যেখানে রাষ্ট্রই সব; রাষ্ট্রই শুরু, রাষ্ট্রই শেষ। রাষ্ট্রের ওপর কোনো অতি-রাষ্ট্র বা সুপ্রান্যাশনাল কর্তৃপক্ষ নেই যে রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে বা রাষ্ট্রকে নিজের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করতে পারে। এটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা। স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব আলাদা। স্বাধীনতা ভৌগোলিক এবং নিরাপত্তাজনিত বিষয়। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার প্রশ্ন।

ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে আরাধ্য, সর্বাধিক পূজনীয়। রাষ্ট্র কখনোই এই ক্ষমতায় অংশীদার চায় না। রাষ্ট্র চায় না তার ওপর বাইরের কেউ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিক। এবং এই কারণেই রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিষয়ে কারও হস্তক্ষেপ চায় না—জাতিসংঘেরও না। জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার এটিই মূলসূত্র।

স্পিল ওভার ইফেক্ট তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিষয়ে কারও নাক গলানো পছন্দ করে না বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক লাভ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরিও করে না। যদি খুব তীব্র অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক লাভের ক্ষেত্র গড়ে তোলা যায়, তবে একসময় রাজনৈতিক বিষয়েও তা গড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সেক্টরে সহযোগিতার প্রভাব একসময় রাজনৈতিক সেক্টরকেও প্রভাবিত করতে শুরু করবে—অর্থনৈতিক গ্লাসের পানি রাজনীতিতে গড়িয়ে পড়বে।

রবার্ট স্কুম্যান ইউরোপের স্টিল এবং কয়লার যৌথ বাজার গড়ে তোলার কথা বলেন। ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কম্যুনিটি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দেন। যা বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আদি প্রতিষ্ঠান। কালের বিবর্তনে সেই স্টিল আর কয়লার বাজার এখন বিশ্বের একমাত্র সুপ্রান্যাশনাল অর্গানাইজেশন—ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহও এখন রাষ্ট্রীয় রাজধানীতে নেওয়া হয় না, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাজধানী ব্রাসেলসে নেওয়া হয়।

কয়লার বাজার কয়লাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা, ভিসামুক্ত চলাচল থেকে শুরু করে একক মুদ্রা ইউরোর মতো অতি স্পর্শকাতর বিষয়ও এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাতে। স্পিল ওভার ইফেক্ট এট ইটস বেস্ট। ব্যবসায়ীদের

শুরু করা প্রতিষ্ঠান এখন রাষ্ট্রনেতাদের ক্লাব। যখন রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সাথে জড়িত থাকবে, তখন যুদ্ধের পাঁয়তারা করবে না। কারণ যুদ্ধ কারও স্বার্থই উদ্ধার করবে না। বরং সবাইকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। স্কুম্যান ডিক্লারেশনের উদ্দেশে বলা হয়েছিল—'আমরা যুদ্ধকে শুধু অকল্পনীয়ই করে তুলব না; বরং অসম্ভব করে ফেলব'। ইউরোপের প্রধান চরিত্র—যুদ্ধের কবর রচিত হবে। অতঃপর সকলেই সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিবে।

এটি হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 'বস্তুগত' ইতিহাস। কিন্তু এর বাইরেও আরেকটা 'ইতিহাস' আছে। বর্তমান জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক যে বিশ্বব্যবস্থা, এর উত্থান ইউরোপের কোল থেকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ভেবেছিল যুদ্ধের মূল কারণ 'ধর্ম'। সাম্রাজ্যগুলোর ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে তৈরি হচ্ছে সংঘাত। ফলে সংঘাত রোধ করার উপায় হলো রাষ্ট্র থেকে 'ধর্ম'-কে ছেটে ফেলা। গড়ে উঠে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা।

কিন্তু ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র ইউরোপের দুঃখ ঘুচাতে পারেনি। অসংখ্য সংঘাতের পাশাপাশি দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ শুধু ইউরোপকেই নয়; বরং গোটা বিশ্ববাসীকেই ভুগিয়েছে। সেক্যুলার ন্যাশন স্টেট যেহেতু ইউরোপের সংঘাত রোধ করতে পারেনি, তারপর কী?

সেই ধারণা থেকে গড়ে উঠে রেজিওনালিজম বা আঞ্চলিকতাবাদ। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে 'ইউরোপিয়ান' হয়ে উঠবে। গড়ে উঠবে সর্ব-ইউরোপিয়ান পরিচিতি।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সফলতা দেখে প্রতিটা অঞ্চলেই আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তোলা হবে। বহু বছর, বহু দশকে সেই 'আঞ্চলিক' রাষ্ট্রগুলো যখন স্থিতিশীল হয়ে যাবে, ক্রমান্বয়ে পৃথিবী 'বিশ্ব' নাগরিকতার পথে যাত্রা করবে।

এখানে ইউরোপের মূল স্বপ্নটা ছিল—জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ইউরোপে। সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে জাতিরাষ্ট্র শুধু নয়; বরং রাষ্ট্র চালাতে অন্য যেসব 'টুলস' লাগে, সেগুলোও এসেছে পশ্চিম থেকে; সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, ক্যাপিটালিজম, ইডুকেশন ও আধুনিক বিশ্বের অন্য 'ধর্মসমূহ'। এভাবে পুরো পৃথিবী আদতে ইউরোপিয়ান মডেলে পরিচালিত। পৃথিবীর অঘোষিত মতাদর্শিক মোড়ল 'পশ্চিম'।

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, রেজিওনালিজমের সরাসরি উদ্ভাবক ইউরোপ। যখন পৃথিবী আঞ্চলিকতাবাদ কর্তৃক পরিচালিত হবে, সেই পৃথিবীর 'মতাদর্শিক গুরু'ও থাকবে ইউরোপ। আঞ্চলিকতাবাদের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব যখন 'বৈশ্বিক'

নাগরিকতার ধাপে উন্নীত হবে, সেই পৃথিবীর বাগডোরও থাকবে খুব স্বাভাবিকভাবেই—ইউরোপে!

কিন্তু যদি কোনো কারণে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্যর্থ হয়? যদি তাদের আঞ্চলিকতাবাদ সফল না হয়? যদি বিশ্বনাগরিকতার ছদ্মাবরণে পৃথিবীর 'মস্তিষ্ক' নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কাজে না আসে? ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার যে মর্মবেদনা, তার প্রকৃত উৎস এখানেই। নিজেদের মধ্যকার হানাহানি ফিরে আসার পাশাপাশি ইউরোপের বৈশ্বিক মোড়লিপনার অবসান ঘটবে। হয় গড়ে উঠবে নতুন কোনো কেন্দ্র, নতুন 'ইজম' এবং নতুন বিশ্ব। সেই বিশ্বে ইউরোপ আর রাজার আসনে থাকবে না। প্রজার আসনে থাকবে। কলোনিয়াল দখলদারদের জন্য এর চেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন আর হয় না। হতেই পারে না।

সেই দুঃস্বপ্ন কীভাবে খোদ ইউরোপের অভ্যন্তরেই জন্মাচ্ছে, বেড়ে উঠছে এবং ইউরোপকে গ্রাস করে নেওয়ার আতঙ্ক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে; আজকে সেই গল্পই শুনব।

রাকিবুল হাসান
শিক্ষার্থী; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১, ২৮, ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

চকচক করলেই যে সোনা হয় না তার এক নিপুণ উদাহরণ ইউরোপ। যে ইউরোপে যাওয়া ও সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারাকে 'তৃতীয় বিশ্বে'র অধিবাসীরা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, সে ইউরোপ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু স্থায়ী? নাকি এটা কাচের মতো, বা তার চেয়েও ঠুনকো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ইভান ক্রাস্তেভ "After Europe" গ্রন্থে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে বাইরে থেকে শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও নানা সংকট একে কাবু করে ফেলেছে। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে পুরো ইউরোপজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইউনিয়নের ভেতর পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন, ব্রেক্সিট, জ্বালানি সংকট, অভিবাসন ও শরণার্থী সংকট। এর মধ্যে বেশির ভাগেরই ইউরোপকে বিভাজিত করার ও ইউনিয়নকে ভেঙে ফেলার সক্ষমতা আছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টিকে থাকার না ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কোন কোন বিষয়গুলো এর পেছনে অবদান রাখতে পারে, ইউনিয়ন ভেঙে গেলে এরপর কী ঘটবে, কীভাবে এ ভাঙনকে রোধ করা বা অন্তত বিলম্বিত করা যায়, ভাঙন কি ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জন্য কল্যাণকর হবে কী না, এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন লেখক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

লেখকের যে গুণটা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো সেটা হচ্ছে, "অস্বস্তিকর" বিষয়ে আপসহীন ও যুক্তিভিত্তিক কথা বলতে পারা। বিষয়বস্তুর অন্ধকার দিকগুলো তাকে কাবু করতে পারে না, তিনি স্বচ্ছভাবে নিজের ভাবনাকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তুলতে পারেন, যা আবার একেবারে সরলীকরণের দোষও দুষ্ট হয় না।

ক্ষুদ্র এ গ্রন্থটিকে বলা যায় কয়েকটি ছোট ছোট রচনার সমষ্টি। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠকের কাছে উপভোগ্য হবে। তারা গণতন্ত্র, লিবারেলিজমের ভঙ্গুরতা সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পাবেন, যদিও সেটা এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আবু বকর সিদ্দীক ভাই এবং সম্পাদক রাকিবুল হাসান ভাই-সহ গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনে যারা যারা শ্রম দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। গ্রন্থটি থেকে উপকারী জ্ঞান অর্জনের তাওফিক দিন। আমিন।

শাহেদ হাসান
৩০/১১/২০২২ খ্রি.

ভূমিকা

দেজা ভ্যু মাইন্ডসেট

১৯১৪ সালের জুনের শেষের দিকের কথা। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের[১] সীমান্তের একটি প্রত্যন্ত গ্যারিসন শহরে একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছায়। টেলিগ্রামে বড়ো হাতের অক্ষরে কেবল একটি বাক্য লেখা ছিল—'সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে সারাজেভোতে হত্যা করার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।' টেলিগ্রামটি দেখে সম্রাটের এক অফিসার কাউন্ট বাত্তিয়ানি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তার স্থানীয় হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় স্বদেশীয়দের কাছে আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্ডের মৃত্যু সম্পর্কে গড়গড় করে কথা বলতে শুরু করে। ফার্দিনান্দকে কিছুটা স্লাভঘেঁষা মনে করা হতো। লেফটেন্যান্ট জেলাসিচ একজন স্লোভেন। তিনি হাঙ্গেরিয়ানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, বিশেষ করে সিংহাসনের প্রতি তাদের সন্দেহজনক আনুগত্যের কারণে। তাই তার দাবি, কথাবার্তা হতে হবে প্রচলিত জার্মান ভাষায়। "ঠিক আছে, তাহলে জার্মানেই বলছি আমি," কাউন্ট বাত্তিয়ানি বললেন। "আমি ও আমার দেশবাসী সবাই বেজন্মাটার মৃত্যুতে খুশি।"

এভাবেই সমাপ্তি ঘটে বহুজাতিক হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের—অন্তত এভাবেই চিত্রায়ণ করেছিলেন জোসেফ রথ তার উপন্যাস *The Radetzky March*-এ।[২] সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ছিল কিছুটা হত্যাকাণ্ড, কিছুটা আত্মহত্যা আর অনেকাংশে দুর্ভাগ্য। সাম্রাজ্যটির পতনের কারণ প্রশাসনিক পরিচালনাগত দুর্বলতা নাকি এটি

---

[১] হ্যাবসবার্গ মূলত বর্তমান সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত একটি দুর্গের নাম। পরবর্তী সময়ে নির্মাতার উত্তরসূরিরা এর নামে তাদের পরিবারের নামকরণ করে—হ্যাবসবার্গ রাজপরিবার। এই পরিবার ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক পরিবারগুলোর একটি। ১১ শতক থেকে শুরু করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই পরিবারের সদস্যরা ইউরোপের বিশাল অংশ শাসন করেছে। পরিবারে ভাঙন-পুনর্মিলন হয়েছে, ফলে তাদের সাম্রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড ও পুনরায় একত্রিত হয়েছে। সর্বশেষ ভাঙন ছিল ১৮৬৭ সালে। এ সময় অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি দুটি অঞ্চল নিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। যেখানে হাঙ্গেরিয়ানরা অস্ট্রিয়ানদেরকে দেখতে পারত না। আবার দুই অংশের শাসকরা সম্মিলিতভাবে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা শাসন করত। বসনিয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিহত হওয়ার পর ধারণা করা হয়, এতে তাদের পার্শ্ববর্তী সার্বিয়ান সাম্রাজ্যের হাত ছিল। সেই প্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেরকম ইউরোপের নানা জাতি, ভাষা ও বর্ণের মানুষের মিলনমেলা, অনুরূপ হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যও পুরো ইউরোপজুড়ে বহু জাতি-গোষ্ঠীকে শাসন করত।—সম্পাদক

[২] Joseph Roth, *The Radetzky March* (London: Granta Books, ২০০৩).

ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাতে সাম্রাজ্যের নৃশংস হত্যা—এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদরা দ্বিমত পোষণ করেন। তবে ঘটনা যা-ই হোক, ব্যর্থ হ্যাবসবার্গ এক্সপেরিমেন্টের প্রেতাত্মা এখনও ইউরোপিয়ানদের তাড়িয়ে বেড়ায়। অস্কার জাসজি ছিলেন রাজতন্ত্রটির পরিসমাপ্তির সরাসরি ও ঐতিহাসিক সাক্ষী। তিনি লেখেন, "যদি অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান স্টেইট এক্সপেরিমেন্ট প্রকৃতপক্ষেই সফল হতো, তবে হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্র তার রাজত্বে বর্তমান ইউরোপে বিরাজমান সবচেয়ে মৌলিক সমস্যার সমাধান করে ফেলত। সমস্যাটা হচ্ছে—ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও চেতনার মানুষকে কীভাবে একীভূত করা সম্ভব, যেখানে সবাই নিজেদের মতো জীবন পরিচালনা করতে পারবে, একইসাথে জাতীয় সার্বভৌমত্ব সীমিত রাখা হবে যেন শান্তিপূর্ণ ও কার্যকরী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভবপর হয়?"[৩]

যেমনটা আমরা জানি, এক্সপেরিমেন্টটা কখনোই চূড়ান্ত সমাধানে আসেনি, কারণ ইউরোপ তার সবচেয়ে জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। জোসেফ রথের গল্প আমাদেরকে এই শক্তিশালী বার্তা দেয় যে, যখন মানবসৃষ্ট ভঙ্গুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুনিয়া বিনাশ হতে থাকে, তখন তা খড়কুটোর ন্যায় দ্রুত ভেসে যায়। এখানে সড়ক দুর্ঘটনার মতো আকস্মিক পরিণতি ঘটে। সড়ক দুর্ঘটনায় যেমন নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আপনাআপনি আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তেমনই সাম্রাজ্যের পতনও একপর্যায়ে অনিবার্যভাবে ঘটবেই।

এখন কি ইউরোপও অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর্যায়ে আছে? ব্রিটেনের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন[৪] থেকে বেরিয়ে যাওয়ার গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত (অর্থনৈতিক

---

[৩] Oszkar Jaszi, *The Dissolution of the Habsburg Monarchy* (ACLS Humanities e-book, ২০০৯), ৪.

[৪] ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ২৭টি ইউরোপিয়ান দেশের একটি জোট। এর আদি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের নতুন করে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, ১৯৪৮ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছয়টি দেশ। তখন এটি ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি নামে পরিচিত ছিল। কয়েক ধাপে নাম পরিবর্তন হয়ে ইইউ হয়েছে। নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও বর্তমানে ইইউ-কে বলা হয় Supranational Organization বা এমন প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রের চেয়েও ক্ষমতাধর কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক গতানুগতিক চিন্তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অনুযায়ী বর্তমান রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে জাতিরাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ওপর কোনো 'সুপ্রান্যাশনাল' কর্তৃপক্ষ নেই, এবং বর্তমান রাষ্ট্রগুলো 'ইগোইস্টিক'। অর্থাৎ রাষ্ট্র কখনো নিজের সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে ভাগ বসাতে দেয় না। এবং এ কারণেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সফল হতে পারে না, কারণ কোনো রাষ্ট্রই চায় না একমাত্র রাষ্ট্র বাদে ভিন্ন কেউ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাক গলাক।

এ ক্ষেত্রে শুধু ইইউ ব্যতিক্রম। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিজস্ব মুদ্রা আছে (ইউরো)। বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী এই মুদ্রাটি কোনো দেশের মুদ্রা নয়, এটি একটি সংগঠনের মুদ্রা! যা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটনা। অনুরূপ ইইউর নিজস্ব পাসপোর্ট আছে, যে পাসপোর্টের মাধ্যমে ইইউভুক্ত সমস্ত দেশে ভ্রমণ করা যায়।—সম্পাদক

বিবেচনায় এটি ২০টি ছোটো ইইউ সদস্য দেশের বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য) এবং মহাদেশে ইউরোস্কেপটিক[৫] পার্টির উত্থান উভয়ই কি ইউরোপের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয়? নাকি সমস্যা জিইয়ে রাখার? ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভাগ্যাকাশেও কি হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের মতো পতন লিখিত আছে?

জ্যান জিলোঙ্কা যথাযথ পর্যবেক্ষণই করেছেন—"আমাদের কাছে ইউরোপকে একীভূতকরণের (integration) অনেক তত্ত্ব থাকলেও ইউরোপের বিচ্ছিন্ন হওয়ার (disintegration) কোনো তত্ত্ব নেই।"[৬] এটা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেনি। ইউরোপিয়ান প্রজেক্টের পুরোধারা নিজেদের ধোঁকা দিয়েছেন যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা এড়িয়ে গেলেই যেন একে ভেঙে পড়ার হাত থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করা যাবে। তাদের কাছে ইউরোপের একীভূতকরণ দ্রুতগামী ট্রেনের মতো—যা কখনো থামে না, কখনো পেছনে ফিরে তাকায় না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে তাদের কৌশল ছিল ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকেই তিরোহিত

---

[৫] ব্রিটেন ১৯৭৩ সালে তৎকালীন ইউরোপিয়ান কম্যুনিটিতে (যা বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পূর্বসূরি) যোগদান করে। কিন্তু যোগদানের পর থেকে কখনোই ব্রিটেন ইইউর সাথে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করেনি। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটেন নিজেকে ইউরোপের বড়ো ভাই মনে করে। কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অংশ হিসেবে বহু ক্ষেত্রে ব্রিটেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, সিদ্ধান্ত হয়েছে ইইউর হেডকোয়ার্টার ব্রাসেলসে। এই দ্বন্দ্ব লন্ডন বনাম ব্রাসেলস দ্বন্দ্ব হিসেবে পরিচিত। এবং ইইউ-কে এ রকম সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখাকে বলা হয় ইউরোস্কেপটিসিজম। যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে ইউরোপের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার মনে করে তাদের এই মনোভাবকে বলা হয় ইউরোসেন্ট্রিজম।

ইইউর সাথে ব্রিটেনের সমস্যা বহুমাত্রিক। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে—সার্বভৌমত্ব, অভিবাসন, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটা বহু রাষ্ট্রের নিকটই গুরুত্বপূর্ণ, যা পূর্বেই বলেছি। ইইউ তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে একটা দেশের ওপর, এটি অনেক দেশই সহ্য করতে পারে না। বিশেষত যখন ইইউর সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, কিন্তু ইইউর নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র ইইউর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এ রকম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে অভিবাসন। আরব বসন্তের পর, বিশেষত ২০১৫ সালে সিরিয়ায় রাশিয়ার হস্তক্ষেপের পর মর্মান্তিক শরণার্থী সমস্যা শুরু হয়। লাখ লাখ সিরীয় ইউরোপে পৌঁছে। এবং একে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। কারণ, বহু রাষ্ট্রই শরণার্থী নিতে আগ্রহী ছিল না। বিশেষত যেসব দেশ নিজেরাই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী না। আবার হাঙ্গেরির মতো কিছু দেশ বিদেশিদের প্রতি কট্টর বিদ্বেষের কারণেও শরণার্থীদের জায়গা দিতে আগ্রহী ছিল না।

ব্রিটেন ইইউ থেকে বের হয়ে যাবে কি যাবে না, তা নিয়ে ২০১৬ সালে গণভোট হয়েছে। বের হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া ব্রেক্সিট হিসেবে পরিচিত। ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ৫১ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। ইইউ-কে দেখা হয় 'সর্ব-ইউরোপিয়ান' ঐক্য ও পরিচিতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে, সেখানে ব্রেক্সিটকে দেখা হয় সেই সর্ব-ইউরোপিয়ান ঐক্য ও পরিচিতির মুখে চপেটাঘাত হিসেবে। ২০২০ সালের ৩১শে জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ব্রিটেনই ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়া একমাত্র দেশ। কট্টর ডানপন্থি দলগুলো নানা কারণে ইউরোপকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। এই জাতীয় দলগুলোকে বলা হয় ইউরোস্কেপটিক।—সম্পাদক

[৬] Jan Zielonka, *Is the EU Doomed?* (Cambridge: Polity Press, ২০১৪)

করে দেওয়া। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এত বেশি পরিমাণ সুবিধা প্রধান করা হবে, ইউনিয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো এত বেশি সেক্টরে উপকৃত হবে যে, তাদের চিন্তায় ইউনিয়ন ছেড়ে যাওয়ার কল্পনাই আসবে না।

তবে বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব না থাকার আরও দুটি কারণ আছে। প্রথমটি হলো, সংজ্ঞায়ন সমস্যা। বিচ্ছিন্নতা বা ডিসইন্টেগ্রেশনকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব? ইউনিয়নের সংস্কার বা পুনর্গঠন থেকে কীভাবে বিচ্ছিন্নতাকে আলাদা করা যায়? ইউরোজোন থেকে, অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকেই কয়েকটা দেশ বের হয়ে গেলে সেটাকে কি বিচ্ছিন্নতা বিবেচনা করা হবে? নাকি ইউনিয়নের বৈশ্বিক প্রভাব এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যদি ভেঙে পড়ে (যেমন ইউরোপজুড়ে ভিসা ফ্রি জোন বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোর্ট অব জাস্টিসের মতো প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি) তবে কি তা ইউনিয়নের বিলুপ্তি হিসেবে গণ্য হবে? ইউনিয়নের দুই ভাগে বিভক্তিকরণ কি বিচ্ছিন্নতা, নাকি একীভূতকরণের দিকেই আরেক ধাপ অগ্রসর হওয়া?[৭] ইউনিয়নের সংখ্যাগুরু অনুদারপন্থি গণতান্ত্রিকদের (Illiberal Democratics) পক্ষে কি সম্ভব হবে একই রাজনৈতিক প্রকল্পকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়া?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার ভয়ে কাবু হয়ে যায়, ঠিক তখনই ইউরোপের ঐক্য আরও বেড়ে যায়। ইউরোপের নানা দেশে আর্থিক সংকট যখন চরমে, তখনই ইউরোপিয়ান ব্যাংকিং ইউনিয়নের ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে। সন্ত্রাসী হুমকির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ইউরোপিয়ানদেরকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে। এবং সবচেয়ে প্যারাডক্সিক্যাল বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেসব সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলো সাধারণ জার্মানদেরকে গ্রিক ও ইতালিয়ানদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে, ওদিকে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিয়ানদেরকে আগ্রহী করেছে জার্মানির অভিবাসননীতির প্রতি। ইউরোপিয়ানরা ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার ভয়ে কাবু, মনে হচ্ছে যেকোনো সময় এটি ভেঙে পড়বে।

বিচ্ছিন্ন ইউরোপ কেমন হবে, তা নিয়ে খুব অল্প সাহিত্যিকই কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেছেন। নাৎসি জার্মানি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হতো, তবে দুনিয়ার কী হাল হতো, এ নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস আছে। অনুরূপ সোভিয়েতরা যদি স্নায়ুযুদ্ধে বিজয়ী

[৭] অর্থাৎ ইউরোপের অনুদার দেশগুলোকে আলাদা করে দিলে, সে ক্ষেত্রে উদার দেশগুলোর মাঝে কি অধিকতর ঐক্য গড়ে উঠবে? এভাবে সমমনা দেশগুলো কি আরও সংহত হবে? নাকি ইউরোপ উদার-অনুদার বিভক্তির ফলে আরও অস্থির হয়ে উঠবে?—সম্পাদক